Raniganj Girls' College
Department of History
Sixth Semester Core Paper (601) for Honours
Paper Name: War and Diplomacy (1914-1945)

ফ্রান্সের নিরাপত্ত সমস্যা

ঐতিহাসিক ই এইচ কারের মতে, ১৯১৯ সালের পর ইউরোপের ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল ফ্রান্সের নিরাপত্তার দাবী (The most important and persistent single factor in European affairs is the years following 1919 was the French demand for security)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে জার্মানির ভবিষ্যত আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্রান্স নিজের নিরাপত্তাহীনতা উপলবদ্ধি করেছিল এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরের সময়। ফ্রান্স প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রাকৃতিক নিরাপত্তা (Physical Guarantee) দাবী করেছিল। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল। অবশ্য সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে পনের বছরের জন্য রাইন নদীর বামতীর মিত্রপক্ষের দখলে থাকবে এবং জার্মানি এই এলাকায় কোন দূর্গ নির্মান করতে পারবে না। তাছাড়া এটাও ঠিক হয় যে, যদি জার্মানি ফ্রান্সকে আক্রমণ করে তবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা ফ্রান্সকে সাহায্য করবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন না করায় এবং একা ইংল্যান্ডের পক্ষে ফ্রান্সের দায়িত্ব নেওয়া অসম্ভব হওয়ায় ফ্রান্সের নিরাপত্তা সমস্যা সমস্যা হিসাবেই থেকে গিয়েছিল।

এরপর ফ্রান্স জাতিসংঘের মাধ্যমে তার নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিল। ফ্রান্স ভেবেছিল জাতিসংঘের মাধ্যমে যদি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কার্যকর করা যায় তাহলে তার সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু জাতিসংগের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা সফল হয়নি কারণ জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সৈন্য বাহিনী ছিল না।

ফ্রান্স নিজের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য সামরিক চুক্তি (Policy of Military Alliance)সম্পাদনের নীতিও গ্রহণ করেছিল। এই সময়কালে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল জোটবদ্ধতা। তাই জার্মান ভয়ে ভীত বেলজিয়ামের সঙ্গে ১৯২০ সালে এবং পোল্যান্ডের সাথে ১৯২১ সালে প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। পারস্পরিক সামরিক সাহায্যের ভিত্তিতে জার্মানির বিরুদ্ধে একটি নিরাপত্তা বলয় তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছিল ফ্রান্স। ফ্রান্সের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল 'ক্ষুদ্র আঁতাত' ভুক্ত তিনটি দেশ—চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। এই তিনটি দেশও ফ্রান্সের মতই নিরাপত্তাহীনতার শিকার ছিল। ফ্রান্স এইভাবে নানা দেশের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিজের নিরাপত্তাকে অনেকটাই নিশ্চিত করেছিল।

চুক্তি-নীতির সমান্তরাল ভাবে ফ্রান্স আরেকটি প্রচেষ্টা নিয়েছিল, তাহল জার্মানিকে আর্থিক ভাবে পঙ্গু করার। ক্ষতিপূরণের নামে ভার্সাই চুক্তিতে বিশাল পরিমান আর্থিক বোঝা জার্মানির উপর চাপাতে ফ্রান্স সফল হয়েছিল। এরপর ক্ষতিপূরণের অর্থ অনাদায়ের অজুহাতে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম জার্মানির শিল্প-সমৃদ্ধ রূঢ় অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। এছাড়া জার্মানিকে নিরস্ত্রীকরণের সব ধরণের চেষ্টা করে ফ্রান্স ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ জার্মানি তার অস্ত্র-ভান্ডার বাড়াতে থাকে, যা ফ্রান্সের নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল।

নিরাপত্তাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের এত আয়োজন যে দেশের বিরুদ্ধে সেই জার্মানিই ফ্রান্সকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতে এগিয়ে এসেছিল ১৯২২ সালে, ফ্রান্স তখন রাজি না হলেও জার্মানি চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং ১৯২৫ সালে সাফল্য লাভ করে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুস্তাভ

স্ট্রেস্‌ম্যানের উদ্যোগে জার্মানি, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম পরস্পরকে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং 'ভার্সাই সীমান্ত' স্বীকার করে নেয়। এই আলোচনায় ইউরোপীয় দেশগুলি অংশ গ্রহণ করে। ইংল্যান্ড, ইটালীসহ বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডও এগিয়ে এসেছিল। যার ফলশ্রুতি ছিল ১৯২৫ সালের লোকার্নো চুক্তি। এই চুক্তি ফ্রান্সের নিরাপত্তা জনিত সমস্যার সাময়িক সমাধান করেছিল এবং হিটলারের উত্থানের আগে পর্যন্ত ফ্রান্স ও জার্মানির সম্পর্ক ভাল ছিল। ১৯২৬ সালে স্বাক্ষরিত হয় রুশ-জার্মান সহযোগিতার চুক্তি। ইটালী ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অবসান ঘটেনি। এই প্রেক্ষাপটে ১৯২৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স কেলোগ-ব্রিঁয়া চুক্তি করে যুদ্ধকে বে-আইনি ঘোষণা করেছিল। এই চুক্তি অনুসরণ করে পৃথিবীর ৬৫টি দেশ যুদ্ধ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ পথে চলার প্রতিশ্রুতি দিলে ফ্রান্সের দুশ্চিন্তা কিছুটা লাঘব হয়।

১৯২৯ সালের মহামন্দার সময় থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল। হিটলারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ফ্রান্স সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার প্রতি সন্দেহ নিয়েই ১৯৩৫ সালে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। এরই পাশাপাশি ইটালীর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য ফ্রান্স সচেষ্ট হয়। কারণ এইসময় ইটালীও হিটলারের আগ্রাসনে চিন্তিত ছিল। ফলস্বরূপ ইটালী ও ফ্রান্স-এর মধ্যে ১৯৩৫ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইটালীকে সন্তুষ্ট করার জন্য ফ্রান্স আফ্রিকায় তার সাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইটালীকে দেয়। কিন্তু তা স্বত্ত্বেও এই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি, ইটালী ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে হিটলারের পক্ষে যোগ দিয়েছিল।

এদিকে হিটলার রাইনল্যান্ড অধিকার করে দূর্গ প্রাকার 'সিগফ্রিড লাইন' নির্মান করে। এর পাল্টা, ফ্রান্স নিজের সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য 'ম্যাজিনো লাইন' নির্মান করেছিল। এরপর ফ্রান্স নিরাপত্তার জন্য ইংল্যান্ডের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ১৯৩৬-৩৯ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স হিটলারকে তোষণ করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের এই নীতি ফ্যাসীবাদী শক্তির উত্থানের পথ মসৃন করে বিশ্ব-নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেছিল। হিটলার ১৯৩৯ সালে পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। আর ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের আশঙ্কাকে বাস্তবায়িত করে জার্মানির হাতে ফ্রান্স-এর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছিল।

অবশেষে বলা যায়, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ফ্রান্স তার নিরাপত্তা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি। জাতিসংঘ, সামরিক চুক্তি, লোকার্ণো চুক্তি ও কেলোগ-ব্রিঁইয়া চুক্তি ফ্রান্সকে সাময়িকভাবে আশ্বস্ত করলেও পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারেনি। আর ১৯২৯ সালের মহামন্দার সময় সমস্ত নিরাপত্তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হিটলার তথা নাৎসীদলের উত্থান ফ্রান্সকে তার নিরাপত্তা সম্পর্কে আশঙ্কিত করে তুলেছিল। সামরিক চুক্তি, ম্যাজিনো লাইন, ইংল্যান্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং তোষণ নীতির মাধ্যমে নিরাপত্তার সন্ধান— কোন কিছুই ফ্রান্সকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। ১৯৪০ সালে জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করে দুই দশক ধরে ফ্রান্সের নিরাপত্তা-সন্ধানের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ প্রমাণিত করেছিল।